শারহুল আক্বীদা আত্-ত্বহাবীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১. তাওহীদের সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী (রহিমাহুল্লাহ)

তাওহীদুল উলুহীয়া ছিল নাবী-রসূলদের দাওয়াতের মূলভিত্তি

সুতরাং জানা গেল, নাবী-রসূলগণ যেই তাওহীদের প্রতি আহবান করেছেন তা হলো তাওহীদুল উলুহীয়াহ। তবে এটি তাওহীদে রবুবীয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ তা‘আলা সূরা রূমের ৩০ নং আয়াতে বলেন,

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (30) وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35) وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾

‘‘হে নাবী! তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজের চেহারাকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। এটাই আল্লাহর ফিতরাত[1] (প্রকৃতি), যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ অভিমুখী হয়ে তাকেই ভয় করো, ছলাত কায়েম করো এবং মুশরিকদের অন্তরর্ভুক্ত হয়ো না। লোকদের অবস্থা হচ্ছে, যখন তারা কোনো কষ্ট পায় তখন নিজেদের রবের দিকে ফিরে তাকে ডাকতে থাকে তারপর যখন তিনি নিজের দয়ার কিছু স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান তখন সহসা তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক শির্কে লিপ্ত হয়ে যায়। যাতে আমার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। আচ্ছা তোমরা ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আমি কি তাদের কাছে কোনো দলীল অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের শির্কের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়? আর যখন লোকদের দয়ার স্বাদ আস্বাদন করাই তখন তারা তাতে আনন্দে উৎফুলস্ন হয়ে উঠে এবং যখন তাদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে তাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে তখন সহসা তারা হতাশ হয়ে যায়’’ (সূরা রূম ৩০:৩০-৩৬)

আল্লাহ তা‘আলা সূরা ইবরাহীমের ১০ নং আয়াতে বলেন,

﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

‘‘তাদের রসূলগণ বলেছিলেন, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা আল্লাহ্ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ আছে কি?’’ রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«كل مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ» (بخارى:1359)

‘‘প্রতিটি শিশু ফিতরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে। তার পিতা-মাতা ইহুদী হলে তাকে ইহুদী বানিয়ে দেয় অথবা খৃষ্টান হলে তাকে খৃষ্টান বানিয়ে দেয় অথবা অগ্নি পূজক হলে তাকে অগ্নি পূজক বানিয়ে দেয়। যেমন চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত একটি চতুষ্পদ জন্তু হিসাবেই ভূমিষ্ঠ হয়। তোমরা তার নাক-কান কাটা দেখতে পাও কি?’’

এটা বলা যাবে না যে, এখানে অর্থ হলো শিশু এমন সাদাসিধে অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে যে, সে না জানে তাওহীদ এবং না জানে শির্ক কী জিনিস। কেউ কেউ এ কথা বলে থাকে। তাদের কথা ঠিক নয়। তার দলীল হলো উপরোক্ত আয়াতগুলো। হাদীছে কুদসীর মধ্যে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

«إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ»

‘‘নিশ্চয়ই আমি আমার বান্দাদেরকে তাওহীদে বিশ্বাসী করেই সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে সরিয়ে ফেলেছে’’।[2]

একটু পূর্বে যে হাদীছ অতিক্রান্ত হয়েছে, তা এ কথাই প্রমাণ করে। তাতে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ،

‘‘তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বানিয়ে দেয় অথবা তাকে খৃষ্টান বানিয়ে দেয় অথবা তাকে অগ্নি পূজক বানিয়ে দেয়’’।

এখানে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি যে, ويسلمانه ‘‘অথবা তারা তাকে মুসলিম বানিয়ে দেয়’’। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক শিশুই মিল্লাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। আরেক বর্ণনায় এসেছে, এ মিল্লাতের উপর জন্মগ্রহণ করে।

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদই প্রদান করেছেন। বিবেক ও জ্ঞানগত দলীলসমূহ এ কথারই সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে। জ্ঞানগত দলীলসমূহ নিম্নরূপ:

(১) কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষ এমনসব আক্বীদাহ, ধারণা ও পরিকল্পনা অর্জন করে, যা কখনো সত্য হয় আবার কখনো মিথ্যা হয়। আর মানুষ তো ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চলমান সংবেদনশীল সৃষ্টি। তার মধ্যে হক বা বাতিলের যে কোনো একটি থাকবেই। সেই সাথে দু’টির একটিকে অগ্রাধিকার প্রদানকারী বিষয় মানুষের স্বভাবের মধ্যে থাকা আবশ্যক। আমরা সকলেই অবগত আছি যে, যখন প্রত্যেক মানুষের নিকট স্রষ্টার অস্তিত্বকে সত্যায়ন করা ও তা থেকে উপকৃত হওয়ার বিষয়টি পেশ করা হয় এবং তাকে মিথ্যায়ন ও তার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি পেশ করা হয়, তখন সে স্বীয় সৃষ্টিগত স্বভাবের দ্বারাই সত্যায়ন করা ও উপকৃত হওয়ার দিকেই ধাবিত হবে। বিষয়টি যখন ঠিক এ রকম, তাই স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বীকৃতি প্রদান করা এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করাই সঠিক অথবা সঠিকের বিপরীত। এখানে দ্বিতীয় কথাটি অকাট্যভাবেই বাতিল।

সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে প্রথমটিই সুসাব্যস্ত হয়েছে। অতএব মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে, যা স্রষ্টার পরিচয় সম্পর্কে জানা এবং তার প্রতি ঈমান আনয়নের দাবি জানায়। তারপর দেখতে হবে বান্দার ফিতরাতের মধ্যে কি এমন বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে, যা বান্দার জন্য উপকারী? না কি উপকারী জিনিসের প্রতি তার অন্তরে কোনো আগ্রহ ও ভালোবাসা নেই? এখানে দ্বিতীয় কথাটি নিঃসন্দেহে বাতিল। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, বান্দার ফিতরাতের মধ্যে এমন বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে, যা তার জন্য উপকারী।

(২) মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে তার নিজের জন্য কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ প্রতিরোধের স্বভাব দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সে তার বোধশক্তি ও পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারাই তা করে থাকে। তবে প্রত্যেক মানুষের ফিতরাত নিজের জন্য কল্যাণ অর্জন কিংবা নিজ থেকে অকল্যাণ দূর করতে স্বয়ং সম্পন্ন নয়। সুতরাং ফিতরাত দ্বারা মানুষ তার

নিজের জন্য কল্যাণকর জিনিসকে বেছে নিতে পারে এবং তার জন্য যা ক্ষতিকর, তা চিহ্নিত করতে পারে ও তা থেকে সাবধান হতে পারে। তবে প্রত্যেক মানুষের ফিতরাত নিজস্ব ক্ষমতা বলে তা অর্জন করতে পারে না। বরং তার জন্য সহায়ক বস্তুর প্রয়োজন রয়েছে। যেমন ফিতরাতকে সঠিক শিক্ষা প্রদান করা ও সঠিক পথে পরিচালিত করা অথবা অনুরূপ অন্য কিছু দিয়ে ফিতরাতকে সাহায্য করার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং যখন ফিতরাতের জন্য সহায়ক বস্তু পাওয়া যাবে এবং তার থেকে প্রতিবন্ধক দূর হবে, তখনই ফিতরাতের মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করার যে দাবী রয়েছে, সে দাবি পূরণের পক্ষেই সাড়া প্রদান করবে।

(৩) এটা জানা কথা যে, প্রত্যেক মানুষই ইলম অর্জন এবং সত্য সম্পর্কে জানার ইচ্ছা পোষণ করার যোগ্যতা রাখে। তবে মানুষকে শিক্ষা প্রদান করা এবং সত্য সম্পর্কে জানার উৎসাহ প্রদান করা জ্ঞান অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়; সত্য সম্পর্কে জানার জন্যও যথেষ্ট নয়। মানুষের হৃদয়ে যদি সত্য কবুল করার মত শক্তি এবং তার প্রতি অন্তরের ঝোক না থাকে, তাহলে সে কখনোই সত্য কবুল করতে পারবে না। কেননা নির্বোধ ও পশুকে জ্ঞান শিক্ষা দিলে এবং তার প্রতি উৎসাহ দিলেও কোনো কাজ হয় না। আর এ কথাও জানা যে, বাইরে থেকে আলাদা কোনো শিক্ষা ও সহায়ক বস্তু ছাড়াই মানুষের নফ্স স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারে এবং স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানার জন্য মানুষের নিজের সত্তাই যথেষ্ট। সুতরাং নফসের মধ্যে যখন এ দাবী থাকে এবং তা যখন বিরোধমুক্ত হয় তখন বিরোধমুক্ত দাবি তার চাহিদা মোতাবেক বিষয় হাসিল হওয়া আবশ্যক করে। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে জানা গেল যে, বিরোধমুক্ত ও পরিশুদ্ধ ফিতরাতকে যদি বাইরের কোন জিনিস দ্বারা বিপর্যস্ত না করা হয়, তাহলে সেটা স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং তার ইবাদতকারীতে পরিণত হয়।

(৪) এটা বলা যেতে পারে যে, ফিতরাতের জন্য যখন বাইরের কোনো নষ্টকারী কিংবা সংশোধনকারী না থাকে, তখন তা সংশোধিত ও আসল অবস্থায় থাকার দাবি রাখে। কেননা তাতে ইলম অর্জন এবং সত্য সম্পর্কে জানার ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেই সঙ্গে তার কোনো বিরোধীও বিদ্যমান নেই।

ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করা হয় যে, যুক্তিবাদী ও কালামশাস্ত্রবিদদের একদল লোক স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাওহীদে রুবুবীয়াত সাব্যস্ত করার ব্যাপারে যুক্তি-তর্ক পেশ করার জন্য তার সাথে আলোচনায় বসার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। তখন তাদেরকে তিনি বললেন, এ মাসআলার ব্যাপারে আলোচনায় বসার আগে আমাকে বলো, এটি কি সম্ভব যে, ইরাকের দিজলা নদীতে নৌকা একাই চলাচল করে? নৌকা কি নিজে নিজেই খাদ্যদ্রব্য, পণ্য সামগ্রী ইত্যাদি একাই বোঝাই করে? একাই যাত্রা করে এবং একাই ফিরে আসে ও ঘাটে থেমে যায়? মালপত্র নামিয়ে এটি কি আবার একাই ফিরে যায়? কারো পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও তদারকি ছাড়াই নৌকার পক্ষে কি এসব কাজ করা সম্ভব? তারা সকলেই বললো, এটা অসম্ভব। নৌকার পক্ষে কখনোই তা করা সম্ভব নয়।

এবার ইমাম তাদেরকে বললেন, একটি নৌকার পক্ষে যখন পরিচালক ছাড়া চলাচল করা সম্ভব নয়, তাহলে এ বিশাল সৃষ্টিজগতের উর্ধ্বজগৎ ও নিমণজগতের সবকিছুর পক্ষে কী করে একাই সুশৃঙ্খলভাবে চলাচল করা সম্ভব হতে পারে!! ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ ছাড়া অন্যদের থেকেও এ ঘটনা বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

সুতরাং কোনো লোক যদি তাওহীদে রুবুবীয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করে, যার স্বীকৃতি দিয়ে থাকে এ যুক্তিবাদীরা, সুফীদের অনেকেই যাতে একাকার হয়ে যাচ্ছে, তরীকাপন্থীরা যাকে একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসাবে ঠিক করে নিয়েছে এবং যা উল্লেখ করেছেন, مَنَازِلِ السَّائِرِين গ্রন্থকার এবং অন্যরা, তা সত্ত্বেও সে যদি এককভাবে আল্লাহর ইবাদত না করে এবং তার ইবাদত ব্যতীত অন্যান্যদের ইবাদত বর্জন না করে তাহলে সে অন্যান্য মুশরিকদের ন্যায় মুশরিক হিসাবেই থেকে যাবে।

কুরআনে রয়েছে তাওহীদে রুবুবীয়াতের বিস্তারিত আলোচনা, তার বিশদ বর্ণনা এবং তার বহু উপমা, উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত। কুরআন তাওহীদে রুবুবীয়াহ সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো স্রষ্টা নেই। যেহেতু আল্লাহ ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই, তাই সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। সুতরাং আল্লাহর রুবুবীয়াতই তার উলুহীয়াতের দলীল। কেননা তারা যেহেতু রুবুবীয়াতকে মেনে নিয়েছে এবং উলুহীয়াতের ব্যাপারে মতভেদ করেছে, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের জন্য বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা যখন মেনে নিয়েছো যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো স্রষ্টা নেই, তিনিই যেহেতু তার বান্দাদের উপকার করা এবং তাদের থেকে অকল্যাণ প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখেন, এসব বিষয়ে যেহেতু তার কোনো শরীক নেই বলে তোমরা স্বীকার করে নিয়েছো, তাহলে কেন তোমরা তাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করছো এবং তার সাথে অন্যান্য মাবুদ নির্ধারণ করছো?

আল্লাহ তা'আলা সূরা নামলের ৫৯-৬৪ নং আয়াতে বলেন,

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (61) أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (62) أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

"হে নাবী! বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সালাম তার এমন সব বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি নির্বাচিত করেছেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো আল্লাহ উত্তম? না কি সেই সব মাবুদ যাদেরকে তারা তার শরীক করেছে? কে তিনি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করছেন তারপর তার সাহায্যে এমন মনোরম বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করেছেন, যার গাছপালা উদগত করা তোমাদের আয়ত্তাধীন ছিল না? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? বরং এরাই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এগিয়ে চলেছে। আর তিনি কে যিনি পৃথিবীকে করেছেন বসবাসের উপযোগী এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী ও তার মধ্যেই গড়ে দিয়েছেন পর্বত মালার পেরেক, আর দু'সাগরের মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহর সাথে এসব কাজের শরীক অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? বরং এদের অধিকাংশই অজ্ঞ। কে তিনি যিনি আর্তের ডাক শুনেন যখন সে তাকে আহবান করে কাতরভাবে এবং কে তার দুঃখ দূর করেন? আর কে তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? আল্লাহর সাথে আর কোনো ইলাহ আছে কি? তোমরা সামান্যই চিন্তা করে থাকো। আর কে জল ও স্থলে অন্ধকারে তোমাদের পথ দেখান এবং কে নিজের অনুগ্রহের পূর্বাহ্নে বাতাস কে সুসংবাদ দিয়ে পাঠান? আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে এ শির্ক থেকে যা এরা করে থাকে। আর তিনি কে যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তারপর আবার এর পূনরাবৃত্তি করেন? আর কে তোমাদের জীবিকা দেন আকাশ ও পৃথিবী থেকে? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? বলো, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে প্রমাণ করো"।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর প্রত্যেকটির শেষে আল্লাহ তা'আলা এ প্রশ্ন করেছেন, أَإِلَهٌ مَعَ الله؟ "আল্লাহর সাথে অন্য

কোনো ইলাহ আছে কি?'' অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্য এমন কোনো ইলাহ আছে কি যে এগুলোতে আল্লাহর শরীক থাকে? এটি হচ্ছে অস্বীকারের প্রশ্ন। জানার জন্য এ প্রশ্ন করা হয়নি। এ প্রশ্নটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন স্রষ্টা, প্রভু এবং ইলাহ থাকাকে অস্বীকার করেছে। বাস্তবেই মক্কার মুশরিকরা এ কথা স্বীকার করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উপরোক্ত কাজগুলো করেনি। সুতরাং তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারাই আল্লাহ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণ কায়েম করেছেন। এখানে প্রশ্ন করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে জানতে চেয়েছেন, আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ আছে কি না? যেমন কেউ কেউ ধারণা করে থাকে। কেননা এ অর্থ আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গের সাথে খাপ খায় না। বিশেষ করে যখন জানা গেল, সে সময়ের আরবের মুশরিকরা আল্লাহর ইবাদতের সাথে বহু মাবুদের ইবাদত করতো। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾

''এদেরকে জিজ্ঞাসা করো, কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বড়? বলো, আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আর এ কুরআন আমার কাছে পাঠানো হয়েছে অহীর মাধ্যমে, যাতে তোমাদের এবং আর যার কাছে এটি পৌঁছে যায় তাদের সবাইকে আমি সতর্ক করি। সত্যিই কি তোমরা এমন সাক্ষ্য দিচ্ছো যে, আল্লাহর সাথে আরো অনেক ইলাহ আছে? বলো, আমি তো কখনোই এমন সাক্ষ্য দিতে পারি না। বলো, আল্লাহ তো মাত্র এক এবং তোমরা যে শির্কে লিপ্ত রয়েছো আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত'' (সূরা আল আন'আম: ১৯)। মক্কার মুশরিকরা বলতো,

﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهاً وَاحِداً إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾

''সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে? নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার! (সূরা সোয়াদ: ৫)

কিন্তু তারা এ কথা বলতো না যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এমন কোনো মাবুদের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল না, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বসবাসের উপযোগী এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী এবং তার মধ্যেই গড়ে দিয়েছেন পর্বত মালার পেরেক, আর দুই সাগরের মাঝখানে অন্তরায় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা নামল: ৬১) বরং তারা এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা একাই এ কাজগুলো করেছেন। অন্যান্য আয়াতগুলোর অর্থও অনুরূপ। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

''হে লোক সকল! ইবাদাত করো তোমাদের রবের, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। এর মাধ্যমে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে''। (সূরা আল বাকারা: ২১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ﴾

''হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো এ কথা ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ছিনিয়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ আছে যে এগুলো তোমাদের ফিরিয়ে দিতে পারে? দেখো, কিভাবে আমরা বারবার আমাদের নিদর্শনগুলো তাদের সামনে পেশ করি? এরপরও তারা কিভাবে এগুলো থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়''। (সূরা আল

আনআম: ৪৬) অনুরূপ আয়াত আরো অনেক রয়েছে।

তাওহীদুর রুবুবীয়াকেই এসব যুক্তিবিদ ও কালামশাস্ত্রবিদ এবং তাদের অনুসারী সুফীরা সর্বোচ্চ তাওহীদ হিসাবে তাদের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে নিয়েছে। অথচ এটি সেই তাওহীদুল উলুহীয়ারই অন্তর্ভুক্ত, যা নিয়ে আগমন করেছেন নাবী-রসূলগণ এবং যা সহ নাযিল হয়েছে সমস্ত আসমানী কিতাব।

সুতরাং যখন জানা গেলো যে, তাওহীদুর রুবুবীয়াহ যেহেতু তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবে আলোচিত তাওহীদেরই অন্তর্ভুক্ত, তখন সকলের জন্য জেনে রাখা আবশ্যক যে, নাবী-রসূলগণ যে তাওহীদের আহবান জানিয়েছেন, তার অসংখ্য দলীল রয়েছে। তার মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব সাব্যস্তের দলীলসমূহ এবং রসূলদের সত্যতার প্রমাণসমূহ অন্যতম। কেননা মানুষ স্রষ্টার পরিচয় সম্পর্কে জানা এবং তার প্রতি ঈমান আনয়নের প্রতি যত বেশী প্রয়োজন অনুভব করবে, তার রুবুবীয়াত ও উলুহীয়াতের দলীলগুলো তাদের কাছে ততোই সুস্পষ্ট হবে। সৃষ্টির উপর রহমত স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা নিজেই এগুলো মানুষের সামনে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এগুলো নিছক বিবেক-বুদ্ধির মূল্যায়নে উপকারী দৃষ্টান্ত হলেও তা দ্বারা দ্বীনি উদ্দেশ্য হাসিল হয়। কিন্তু কুরআন বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দলীল-প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বর্ণনা করে না। সুতরাং সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পর গোমরাহী ছাড়া আর কী থাকতে পারে? কোনো বিবরণ থেকে বিবেক ও বোধশক্তি যখন এমন কোনো প্রমাণিত তথ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়, যা সর্ব সমর্থিত তখন তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা এবং তার পক্ষে অন্য কোনো দলীল পেশ করার প্রয়োজন পড়ে না।

স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিবেক ও জ্ঞানগত দলীল-প্রমাণগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে, কাট-ছাঁট ও পরিপাটি করে এবং সংক্ষিপ্ত করে তুলে ধরতে হবে। এটিই কুরআনের পদ্ধতি। কিন্তু এতে ঐসব মূর্খের দল দ্বিমত পোষণ করে, যারা ধারণা করে যে, কুরআনে বিবেক ও বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি-প্রমাণ নেই। তবে যেসব বিষয় কখনো কখনো অস্পষ্ট থাকতে পারে এবং যাতে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কুরআন তা খোলাখুলি বর্ণনা করেছে এবং সে বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

রুবুবীয়াতের মধ্যে শির্ক সংঘটিত না হওয়ার বিষয়টি সকল মানুষেরই জানা ছিল। তারা কখনো এমন দু'স্রষ্টার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করেনি, যাদের উভয়ের সিফাতসমূহ ও কর্মসমূহ পরস্পর সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে কতেক মুশরিক মনে করেছে যে, এমন এক স্রষ্টার অস্তিত্ব রয়েছে, যে কতিপয় মাখলুক সৃষ্টি করেছে। যেমন ছানুবীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্ধকারকে মন্দের স্রষ্টা মনে করে, কাদেরীয়ারা মনে করে মানুষ এবং প্রাণীর কাজ-কর্ম সে নিজেই সৃষ্টি করে এবং মহাকালের প্রভাবে বিশ্বাসী দার্শনিকরা তারকার চলাচল অথবা প্রাণীর আত্মার স্পন্দনকে অথবা প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোকে স্রষ্টা মনে করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এরা এমন কিছু সৃষ্টির অস্তিত্ব সাব্যস্ত করছে, তাদের ধারণায় যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেননি। তারা রুবুবীয়াতের কিছু কিছু বিষয়ে মুশরিক হিসাবে গণ্য। আরব মুশরিকদের কিছু লোক তাদের মাবুদদের মধ্যে কিছু কল্যাণ করার ক্ষমতা থাকা এবং কিছু ক্ষতি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে বলে ধারণা করতো। তারা আরো বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাদের মাবুদরাই কিছু কল্যাণ সাধন কিংবা ক্ষতি প্রতিহত করতে পারে।[3]

সুতরাং কিছু সংখ্যক মানুষ যেহেতু রুবুবীয়াতের মধ্যে শির্কে লিপ্ত হয়েছিল, তাই কুরআন তা বাতিল সাব্যস্ত

করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

‘‘আল্লাহ কাউকে নিজের সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেননি এবং তার সাথে অন্য কোনো ইলাহ নেই। যদি থাকতো তাহলে প্রত্যেক মাবুদই নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো এবং একজন অন্যজনের উপর চড়াও হতো। এরা যেসব কথা তৈরী করে তা থেকে আল্লাহ পাক-পবিত্র’’। (সূরা আল মুমিনুন: ৯১)

এখানে খুব সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট বাক্যের মাধ্যমে যে উজ্জল প্রমাণটি পেশ করা হয়েছে, তার ব্যাপারে আপনি চিন্তা করুন। কেননা সত্য ইলাহ যিনি হবেন, তাকে অবশ্যই সৃষ্টি করা ও কর্ম সম্পাদন করার গুণাবলী সম্পন্ন হতে হবে এবং সৃষ্টির কল্যাণ করার ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে ও তাদের থেকে অকল্যাণ দূর করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

অতএব, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার সাথে যদি অন্য এমন কোনো ইলাহ থাকতো, যে আল্লাহর রাজত্বের অংশীদার, তাহলে তার জন্যও সৃষ্টি করা ও কর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক হতো। তখন আল্লাহ তা‘আলা কখনোই সেই অংশীদারিত্বের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতেন না। বরং সেই শরীককে পরাজিত করার ক্ষমতা থাকা এবং তার নিকট থেকে রাজত্ব ও ইলাহিয়াত ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষমতা থাকার কারণে অবশ্যই তা করতেন। যেমন দুনিয়ার রাজাদের একজন অন্যজন থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে তাদের কেউ যদি অন্যকে পরাজিত করতে পারে এবং অন্যের উপর চড়াও হওয়ার সামর্থ না রাখে, তাহলে তিন অবস্থার যে কোনো একটি হতে পারে।

(১) প্রত্যেক ইলাহ তার সৃষ্টি ও রাজ্য নিয়ে আলাদা হয়ে যাবে অথবা

(২) এক ইলাহ অন্য ইলাহর উপর চড়াও হবে।

(৩) অথবা সকলেই এক রাজার ক্ষমতাধীন থাকবে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা বাকী সকলকে পরিচালনা করবেন। কিন্তু তারা সেই সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর সত্তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। বরং তিনি একাই হবেন ইলাহ আর বাকীরা সকলেই হবে সকল দিক থেকেই তার অধীনস্ত ও প্রতিপালিত বান্দা।

সৃষ্টিজগতের সকল বিষয় সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হওয়া এবং তার নিয়ম-কানুন সুদৃঢ় হওয়াই প্রমাণ করে যে, সৃষ্টিজগতের ব্যবস্থাপক ও পরিচালক হলেন একক ও অদ্বিতীয় ইলাহ। তিনিই প্রকৃত বাদশাহ, একমাত্র প্রভু, তিনি ছাড়া সৃষ্টিজগতের অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের আর কোনো রবও নেই। সুতরাং বিবেক ও বোধশক্তির দলীল প্রমাণ করে যে, সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা হলেন মাত্র একজন, তিনি ছাড়া আর কোনো রব নেই এবং তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদও নেই। সুতরাং সকল সৃষ্টি ও সৃষ্টির কাজ-কর্মের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তাই ইবাদত এবং ইলাহীয়াতও একমাত্র আল্লাহর। সৃষ্টিজগতের জন্য পরস্পর সমান যোগ্যতা সম্পন্ন দু’স্রষ্টা ও দু’জন রব থাকা যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনি তাদের জন্য দু’জন মাবুদ থাকাও অসম্ভব।

সুতরাং পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী দু’জন স্রষ্টার দ্বারা এ সৃষ্টিজগৎ অস্তিত্বে এসেছে, -এ বিশ্বাস করা মূলতঃই অবাস্তব। মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের মধ্যে দ’জন স্রষ্টা দ্বারা সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি অবাস্তব হওয়ার বিশ্বাসই বদ্ধমূল হয়ে আছে এবং বিবেক ও বোধশক্তির সুস্পষ্ট দলীল দ্বারাও ঐ ধারণা বাতিল হয়েছে।

অতএব এভাবেই দ’জন মাবুদের উলুহীয়াত বাতিল সাব্যস্ত হলো।

সুতরাং সৃষ্টিগত স্বভাব ও বোধশক্তির মধ্যে যে তাওহীদে রুবুবীয়াত বদ্ধমূল, স্থির ও স্থায়ী হয়ে আছে, কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটি তাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছে। একই সঙ্গে মানুষের প্রকৃতি ও সৃষ্টিগত স্বভাব একদিক থেকে যেমন আল্লাহর রুবুবীয়াত সাব্যস্ত করছে, অন্যদিকে তাওহীদুল উলুহীয়াতকেও আবশ্যক করছে।

নিমেণর আয়াতটিও উপরোক্ত আয়াতের সমর্থ জ্ঞাপক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

‘‘নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য মাবুদ থাকত, তবে আসমান-যমীন বিধ্বস্ত হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র’’। (সূরা আল আম্বীয়া: ২২)

কোনো কোনো সম্প্রদায় মনে করেছে যে, এটিই হলো বোধশক্তির সে দলীল যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো সৃষ্টিজগতের জন্য পরস্পর সমান যোগ্যতা সম্পন্ন দু’জন স্রষ্টা থাকা অসম্ভব। তারা আসলে আয়াতের অর্থ বুঝতে পারেনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, আসমান-যমীনে যদি তিনি ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকতো.....। তিনি তো এটি বলেননি যে, যদি আসমান ও যমীনে একাধিক রব থাকতো......।

আসমান যমীন-সৃষ্টি হওয়ার পর এ কথা বলা হয়েছে। আসমান-যমীন থাকা অবস্থায় যদি উহাতে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবুদ থাকতো, তাহলে তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হতো। আর আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,لفسدتا আসমান-যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি হতো। তিনি এ কথা বলেননি যে, তা সৃষ্টিই হতো না। মোটকথা আয়াত প্রমাণ করছে যে, আসমান-যমীনে একাধিক ইলাহ থাকা অবৈধ। শুধু তাই নয়; এক ইলাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ থাকা সম্ভবই নয়। আর এ এক ইলাহ হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা। আসমান-যমীনে বহু ইলাহ হওয়া মানেই তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া সে এক ইলাহ যদি অন্য কেউ হয় তাতেও আসমান-যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আসমান ও যমীনের একমাত্র মাবুদ বলেই তা সংশোধিত অবস্থায় রয়েছে। সৃষ্টিজগতের জন্য যদি দু’জন মাবুদ থাকতো, তাহলে সৃষ্টিজগতের শৃংখলা নষ্ট হয়ে যেত। সুতরাং এক আল্লাহর ইনসাফের বদৌলতেই সৃষ্টিজগতের শৃংখলা টিকে আছে এবং তার আদলের কারণেই আসমান-যমীন সুশৃংখল সু-নিপুন অবস্থায় রয়েছে। শির্ক হলো সর্বাধিক বড় যুলুম আর তাওহীদ হলো সর্ববৃহৎ ইনসাফ।

তাওহীদুল উলুহীয়াহ তাওহীদুর রুবুবীয়াতকেও শামিল করে। কিন্তু তাওহীদুর রুবুবীয়াত সাব্যস্ত করলেই তাওহীদুল উলুহীয়াহর বাস্তবায়ন হয় না। যে সৃষ্টি করতে পারে না, সে অক্ষম। আর অক্ষম কখনো ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾

‘‘তারা কি এমন জিনিসকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে, যারা কোন জিনিস সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না বরং নিজেরাই সৃষ্ট?’’। (সূরা আল আরাফ: ১৯১) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

‘‘যিনি সৃষ্টি করেন এবং যে কিছুই সৃষ্টি করে না তারা উভয় কি সমান? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?’’

(সূরা আন নাহাল: ১৭) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾

‘‘হে মুহাম্মদ! এদেরকে বলো, যদি আল্লাহর সাথে অন্যান্য ইলাহ থাকতো যেমন এরা বলে থাকে, তাহলে সে আরশের মালিকের জায়গায় পৌঁছে যাবার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করতো’’। (সূরা বানী ইসরাঈল: ৪২)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় পরবর্তী যুগের আলেমদের দু’টি মত রয়েছে।

(১) আরশের মালিককে পরাজিত করার চেষ্টা করতো।

(২) তার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতো। কাতাদাহ এবং অন্যান্য সালাফ থেকে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। এটিই সঠিক মত। ইমাম ইবনে জারীর এ মতটি ছাড়া অন্য কোন মত উল্লেখ করেননি। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾

‘‘এটি একটি উপদেশ বাণী। এখন কেউ চাইলে তার রবের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে’’। (সূরা দাহর: ২৯) দ্বিতীয় মতটি সঠিক হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ ‘‘যদি আল্লাহর সাথে অন্যান্য ইলাহ থাকতো যেমন এরা বলে থাকে’’। কিন্তু তারা এটি বলতো না যে, সৃষ্টিজগতের জন্য দু’জন স্রষ্টা রয়েছে। বরং তারা আল্লাহর সাথে এমনসব মাবুদ গ্রহণ করেছিল, যাদেরকে তারা আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী মনে করতো। তারা বলেছিল,

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾

‘‘আমরা তো তাদের এবাদাত করি শুধু এ কারণে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে’’। (সূরা যুমার: ৩) এটি প্রথমোক্ত আয়াতের বিপরীত।

ফুটনোট

[1]. মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম লাভকারী প্রত্যেক শিশু আসলে মানবিক প্রকৃতির উপরই জন্ম লাভ করে। তারপর তার মা-বাপ তাকে পরবর্তীতে ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক হিসেবে গড়ে তোলে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন প্রত্যেক পশুর পেট থেকে পুরোপুরি নিখুঁত ও সুস্থ পশুই বের হয়ে আসে। কোনো একটা বাচ্চাও কান কাটা অবস্থায় বের হয়ে আসে না। পরে মুশরিকরা নিজেদের জাহেলী কুসংস্কারের কারণে এর কান কেটে দেয়। প্রত্যেক সন্তানই প্রকৃতির উপর জনম নেয়। যখন কথা বলতে শিখে তখন তার বাপ-মা তাকে ইহুদী-খৃষ্টানে পরিণত করে। অন্য একটি হাদীছে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ ঈয়ায ইবনে হিমার আল মুজাশি'য়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, একদিন নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ভাষণের মাঝখানে বলেন, আমার রব বলেন, আমার সমস্ত বান্দাদেরকে আমি একনিষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছি, তারপর শয়তানরা এসে তাদেরকে দ্বীন থেকে বিপথগামী করে এবং তাদের জন্য আমি যা কিছু হালাল করে দিয়েছিলাম সেগুলোকে হারাম করে দেয় এবং তাদেরকে হুকুম দেয় আমার সাথে এমন বস্তুকে শরীক করতে, যেগুলোকে শরীক করার জন্য আমি কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করিনি।

[2]. মুসলিম হা/২৮৬৫ অধ্যায়: জান্নাত এবং তার সুখগুস্বাচ্ছন্দ ও অধিবাসীদের বর্ণনা, অনুচ্ছেদ যে সমস্ত

গুণাবলী দ্বারা দুনিয়াতে জান্নাতের অধিবাসী ও জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে জানা যায়।

[3]. তবে এ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা সর্বদাই কম ছিল, যা গণনার আওতায় পড়ে না।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8868

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন